আমাদের সময়

তারিখ 15 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

মো. মিঠুন মিয়া

# জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব ভাষাশহীদ রফিক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পাতায় রয়েছেন অনেক স্মরণীয় এবং বরণীয় ব্যক্তিত্ব। আর এই ভাষার মাসে যিনি আমাদের গর্বের জায়গা দখল করে আছেন, তিনি হলেন ভাষা আন্দোলনে অমর শহীদদের অন্যতম রফিক উদ্দিন আহমদ। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিতে রফিক প্রথম শহীদ হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্ত করেন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে। রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন লড়াকু এ বীর সৈনিক। ভাষা যে একটি জাতির অস্তিত্ব তা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করতে প্রাণ বিসর্জন দিতে পিছপা হননি জগন্নাথ কলেজের (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) সাবেক এই শিক্ষার্থী।

দেশ, জাতি, সমাজ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদ রফিক সত্যিই অনুপ্রেরণার এক অনন্ত উৎস। দেরিতে হলেও সাবেক শিক্ষার্থী ও ভাষাসৈনিক রফিককে ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করায় অকপটে সম্মান জানিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ধরে রেখেছে তার স্মৃতি। তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও ভাষাশহীদ রফিকের স্মৃতি রক্ষার্থে ঐতিহাসিক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৮ বছরের মাথায় এবং ভাষা আন্দোলনের ৬২ বছর পূর্তির আগ মুহূর্তে ২০১৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে পুরনে বিজনেস স্টাডিজ ভবনের নাম পরিবর্তন করে 'ভাষাশহীদ রফিক ভবন' নামকরণের প্রস্তাব করা হয়। পরে এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস করা হয়। নতুন নামকরণকৃত 'ভাষাশহীদ রফিক ভবন'-এ বাংলা আর ইতিহাস বিভাগের কার্যালয় রয়েছে। আর এই নামকরণের মধ্য দিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেন। সে সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেছিলেন, 'মহান ভাষা আন্দোলনে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও ভাষাশহীদ রফিকের নামে পুরনো বিজনেস স্টাডিজ ভবন 'ভাষাশহীদ রফিক ভবন' নামকরণ করার মাধ্যমে তার স্মৃতি রক্ষা পেল। এছাড়া ভবিষ্যতে কোনো হল নির্মিত হলে তা ভাষাশহীদ রফিকের নামে নামকরণ করা হবে।'

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একটি ব্যতিক্রমী আন্দোলন, যার সঙ্গে যুক্ত ছিল বাংলাদেশের সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষার প্রশ্ন। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাংলাদেশের জনগণ যে ত্যাগ স্বীকার করেছে, বিশ্বের ইতিহাসে তার কোনো নজির নেই। গত শতাব্দীতে বাঙালি জাতি যে দুটি শ্রেষ্ঠ অর্জন নিয়ে গর্ব করতে পারে তার একটি হলো স্বাধীনতা অর্জন এবং অন্যটি হলো রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করা। দুটি অর্জনই অনন্যসাধারণ। যুদ্ধ করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ত দিয়ে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করা এই দুটি কোনো জাতির পক্ষেই একসঙ্গে করা সম্ভব হয়নি। শুধু বাংলাদেশে নয়, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বিশ্বের অন্যান্য জাতির জন্যও শিক্ষণীয় অবদান রেখেছে। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা বিশ্বের ইতিহাসে বাঙালি জাতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। আর এই ভাষা আন্দোলনে নিহিত ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির আন্দোলন। ভাষার প্রশ্নে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে এবং ছিনিয়ে আনে বিজয়। বর্তমানে বিশ্বের সমৃদ্ধিশালী ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অবস্থান চতুর্থ। বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি মানুষের মুখের ভাষা বাংলা। বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কেবল তাই নয়, বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১৯২৬ সালের ৩০ অক্টোবর মানিকগঞ্জ জেলার পারিল গ্রাম বর্তমানে রফিকনগর, ইউনিয়ন-বলধারা, থানা-সিঙ্গাইরে জন্মগ্রহণ করেন রফিক। ঢাকা সাহিত্য-সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত 'ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি' স্মারকগ্রন্থে জানা যায়, ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ রফিক, পুরো নাম রফিক উদ্দিন আহমদ। পিতার নাম আবদুল লতিফ মিয়া এবং মাতার নাম রাফিজা খাতন। রফিক ছিলেন পিতা-মাতার প্রথম সন্তান। রফিকরা ছিলেন পাঁচ ভাই ও দুই বোন। ভাইদের মধ্যে রফিক ছিলেন সবার বড়। চার ভাই, আবদুর রশীদ (১৯৩১-১৯৮৭), আবদুল খালেক (১৯৩৪), বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম (১৯৪৩-১৯৭২), খোরশেদ আলম (১৯৪৭) এবং বোন আলেয়া বেগম (১৯৩৮) ও জাহানারা বেগম (১৯৪৫)।

শৈশবে গ্রামের স্কুলেই তিনি লেখাপড়া করেন। রফিক বাল্যকালে কিছুটা ডানপিটে ছিলেন। তিনি মরহুম আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ও বীরেন্দ্রমোহন দত্তগুপ্ত শিক্ষকদ্বয়ের সুযোগ্য ছাত্র হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। শৈশবে গাছ থেকে পড়ে তার হাত ভেঙে চিকিৎসার জন্য কলকাতা যান। কলকাতা অবস্থানের সময় মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষা লাভ করেন। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত আব্বাস উদ্দিন আহমদের লেখা 'ভাষাশহীদ রফিক উদ্দিন আহমদ' জীবনী গ্রন্থ মতে, ১৯৪৬ সালে কলকাতায় মহাদাঙ্গার পর রফিক দেশে ফিরে আসেন।

**স্মৃতি রক্ষার্থে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভাষাশহীদ রফিক ভবন' নামকরণ নিঃসন্দেহে একটি যুগোপযোগী কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। আমরা মনে করি, এই সম্মানই যথেষ্ট নয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এই মহান ভাষাসৈনিককে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হোক**

পারিল গ্রামটি খুব সুন্দর সবুজ ফসলি একটি গ্রাম, যে গ্রামে সারা বছর ধান, পাট ও সবজির আবাদ হয়। শহীদ রফিক তার বাড়ি থেকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত বায়রা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। পরে মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন। রফিক মানিকগঞ্জের সরকারি দেবেন্দ্র কলেজে ১ম ও ২য় বর্ষে লেখাপড়া করেন। ১৯৫০ সালে দেবেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষা দেন। বাবার প্রিন্টিং ব্যবসা দেখাশোনার জন্য পরবর্তীকালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। এরপর ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে (বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন রফিক। শহীদ রফিক দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য বিভাগে পড়ালেখা করেছেন। জগন্নাথ কলেজে কোন বিষয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তা নিশ্চিত করে জানা যায়নি। তবে তিনি জগন্নাথ কলেজের নিয়মিত নয়; অনিয়মিত অর্থাৎ সান্ধ্যকালীন কোর্সের ছাত্র ছিলেন বলে জানা যায়। শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি তিনি মাঝে মধ্যে পিতার প্রেসের ব্যবসা দেখাশোনা করতেন।

রফিক সাহিত্যাঙ্গনে ছড়া রচনায় পটু এবং সেলাই ও সূচিশিল্পেও বেশ দক্ষ ছিলেন। লেখাপড়ার অবসরে বাবার ব্যবসার পাশাপাশি শুরু করেন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিচরণ। ছোট থেকেই ছড়া লিখতেন তিনি। এছাড়া সংগীতে তার অনুরাগ ছিল। রফিক সাহিত্য এবং সংস্কৃতিচর্চায় বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। সমাজকল্যাণেও তিনি গভীর আগ্রহী ছিলেন। মানবিক গুণাবলি বিকাশ উপযোগী এসব ক্রিয়াকলাপে আগ্রহ থেকেই রফিকের মধ্যে সৃষ্টি হয় ঢাকার চলমান রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণের তাড়না।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর রফিকের বাবা ঢাকায় চলে আসেন এবং জামাতা মোবারক আলী খানের পরামর্শে বাবুবাজার এলাকায় আকমল খান রোডে 'পারিল প্রিন্টিং প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। যৌথ ব্যবসায়ে পিতা আবদুল লতিফের অপর অংশীদার ছিলেন রফিকের মামা ফেলু খাঁ। তিনিও কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। তবে বছর দেড়েক পর উভয়ের মধ্যে ব্যবসা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং দু'জনে আলাদা হয়ে যান। শ্যালক আলাদা ব্যবসা শুরু করাতে শহীদ রফিকের বাবার পক্ষে মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকা এসে প্রেস দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে তিনি প্রেসের যন্ত্রপাতি ও বণ্টনকৃত মালামাল বিক্রি করে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। কিন্তু শহীদ রফিক পিতাকে পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি ওই প্রেস ব্যবসা দেখাশোনা করবেন বলে জানান। পুত্রের বিশেষ আগ্রহের কারণে শহীদ রফিকের পিতা বাদামতলীতে 'কমার্শিয়াল আর্ট প্রেস' নামে নতুন প্রেস ব্যবসা শুরু করেন। রফিকের অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠায় ব্যবসা সুচারুরূপে চলতে থাকে।

ওই ব্যবসা পরিচালনার স্বার্থেই তিনি জগন্নাথ কলেজের সান্ধ্যকালীন কোর্সে ভর্তি হন। ওই সময় শহীদ রফিকের মতো যারা পড়ালেখার পাশাপাশি অন্য কাজ করতেন তাদের কথা মাথায় রেখেই ওই কোর্সটি চালু করা হয়েছিল। যে কেউ চাইলেই ওই কোর্সে ভর্তি হয়ে কাজের পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারতেন। শহীদ রফিকও ওই সুযোগ নিয়ে তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) লেখাপড়া করেন বলে জানা যায়। এছাড়া আবু সালেহ সেকেন্দারের 'ভাষা আন্দোলনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে একাধিক উৎস থেকে উল্লেখ করা হয়েছে ভাষাশহীদ রফিক উদ্দিন আহমদ জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন।

শহীদ রফিক একই গ্রামের মেয়ে রাহেলা খাতুন পানুকে ভালবাসত। পারিবারিকভাবে তাদের এই ভালবাসাকে মেনে নিয়ে পরিবার থেকে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। সে উপলক্ষেই বিয়ের বাজার করার জন্য তিনি ঢাকায় যান। ২১ ফেব্রুয়ারি বিয়ের শাড়ি-গহনা ও কসমেটিকস নিয়ে সন্ধ্যায় তার বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই মহান ব্যক্তি যখন শুনতে পেলেন বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে মিছিল বের হবে তখন তিনি ছুটে যান ওই মিছিলে।

তৎকালীন সরকার কর্তৃক আরোপিত ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার সঙ্গে তিনিও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গণ ও মিছিলের পদভারে প্রকম্পিত পুরো রাজপথ। এ অবস্থা দেখে পাকিস্তান সরকার দিশেহারা হয়ে ওঠে। ফলে নির্বিচারে ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণ শুরু হয়। একটি গুলি রফিক উদ্দিনের মাথায় বিদ্ধ হয়ে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই রফিক শহীদ হন। মেডিক্যাল হোস্টেলের ১৭ নম্বর রুমের পূর্বদিকে তার লাশ পড়ে ছিল। ছয়-সাতজন ধরাধরি করে তার লাশ এনাটমি হলের পেছনের বারান্দায় এনে রাখেন। তাদের মাঝে ডা. মশারফুর রহমান খান গুলিতে ছিটকে পড়া রফিকের মগজ হাতে করে নিয়ে যান। রফিকই পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রথম শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। তবে পাকিস্তানি হায়েনরা তাকে মেরেই ক্ষান্ত হয়নি, ঢাকা মেডিক্যাল থেকে তার লাশ লুকিয়ে ফেলে এবং জনরোষের ভয়ে পরদিন সেনাদের সহযোগিতায় আজিমপুর কবরস্থানে শহীদ রফিককে দাফন করা হয়। কিন্তু তার কবরে কোনো চিহ্ন রাখা হয়নি। ফলে আজিমপুর কবরস্থানে হাজারো কবরের মাঝে ভাষা শহীদ রফিকের কবরটি অচিহ্নিত থেকে যায়। রফিক উদ্দিন ও অন্যান্য ভাষা শহীদ– সালাম, জব্বার, শফিউর মহান আত্মত্যাগের ফলেই বাংলা ভাষা ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর শহীদ স্মৃতি উত্তরকালে পূর্ববঙ্গবাসীদের মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই চেতনার ভিত্তিতেই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সরকার শহীদ রফিককে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করে। সরকারিভাবে ২০০৬ সালে তার 'পারিল গ্রামে শহীদ রফিকের নামে ভাষাশহীদ পাঠাগার ও স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন করা হয়। যেখানে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও প্রচুর বই আছে। তারও আগে প্রশিকার উদ্যোগে তার বাড়িসংলগ্ন একটি ছোট লাইব্রেরি গঠন করা হয়। যেখানে মূলত তার স্মৃতিগুলো প্রথম থেকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

শহীদ রফিকের পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ সব গণআন্দোলনে নিজেদের গভীরভাবে যুক্ত করেছেন এবং নিজেদের জীবনকে কখনোই দেশের স্বার্থের চেয়ে বড় মনে করেননি। তাই তো ১৬৬৯-এর গণআন্দোলনেও জীবন দিয়েছেন এই পরিবারের সদস্য জনাব ইসহাক। রফিকের ভাই আবদুস সালাম ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। স্মৃতি রক্ষার্থে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভাষাশহীদ রফিক ভবন' নামকরণ নিঃসন্দেহে একটি যুগোপযোগী কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। আমরা মনে করি, এই সম্মানই যথেষ্ট নয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এই মহান ভাষাসৈনিককে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেছেন, 'ভবিষ্যতে কোনো হল নির্মিত হলে তা ভাষাশহীদ রফিকের নামে নামকরণ করা হবে।' আমাদের দাবি হলো হলের সামনেও যেন শহীদ রফিকের একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়। এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শহীদ রফিকের পরিবারকে উপযুক্ত সম্মানে ভূষিত করা হোক– এমনটিই প্রত্যাশা।

লেখক : সাংবাদিক